প্রোফেসর শঙ্কু

মানরো দ্বীপের রহস্য

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM 2021

মানরো দ্বীপের রহস্য

মানরো দ্বীপ, ১২ই মার্চ

এই দ্বীপে পৌঁছানোর আগে গত তিন সপ্তাহের ঘটনা সূর্বই আমার ডায়রিতে বিক্ষিপ্তভাবে লেগু। হাতে যখন সময় পেয়েছি তখন সেগুলোকেই একটু গুছিয়ে লিখে রাখছি।

আমি যে আবার এক অভিযানের দলে ভিড়ে পড়েছি, সেটা বোধ হয় আর বলার দরকার নেই। এই দ্বীপের নাম হয়তো একটা থাকতে পারে, কারণ আজ থেকে তিনশো বছর আগে এখানে মানুষের পা পড়েছিল, কিন্তু সে নাম সভ্য জগতে পৌঁছায়নি। আমরা এটাকে আপাতত মানরো দ্বীপ বলেই বলছি।

আমরা দলে আছি সবসুদ্ধ পাঁচজন। তারমধ্যে একজন হল আমার পুরনো বন্ধু জেরেমি সন্ডার্স–যার উদ্যোগেই এই অভিযান। এই উদ্যোগের গোড়ার কথা বলতে গেলে বিল ক্যালেনবাখের পরিচয় দিতে হয়। ইনিও আমাদের দলেরই একজন। ক্যালিফর্নিয়ার অধিবাসী, দীর্ঘকায় বেপরোয় শক্তিমান পুরুষ, পেশা ছবি তোলা। বয়স পঁয়তাল্লিশ হতে চলল, কিন্তু চালচলন তার অর্ধেক বয়সের যুবার মতো। ক্যালেনবাখের সঙ্গে সন্ডার্সের পরিচয় বেশ কয়েক বছরের। গত ডিসেম্বরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার তরফ থেকে ক্যালেনবাখ গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি শহরে কিছু স্থানীয় উৎসবের ছবি তুলতে। মোরক্কোর আগাদির শহরে এসে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। আগাদির সমুদ্রতীরের শহর, সেখানে অনেক জেলের বাস। ক্যালেনবাখ জেলেপাড়ায় গিয়েছিল সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ছবি তুলতে। একটি জেলের বাড়িতে ঢুকে তার চোখ পড়ে মালিকের বছরতিনেকের একটি ছেলের উপর। ছেলেটি হাতে একটা ছিপিআটা বোতল নিয়ে খেলা করছে। বোতলের ভিতরে কাগজ দেখতে পেয়ে ক্যালেনবাখের কৌতূহল হয়। সে ছেলেটির হাত থেকে বোতল নিয়ে দেখে তার ছিপি সিল করে বন্ধ করা এবং ভিতরের কাগজটা হল ইংরাজিতে লেখা একটা চিঠি। হাতের লেখার ধাঁচ থেকে মনে হয়। সে চিঠি বহুকালের পুরনো। ছেলেটির ব্যাপকে জিজ্ঞেস করে ক্যালেনবাখ জানে যে

ওই বোতল নাকি তার ঠাকুরদাদার আমল থেকে তাদের বাড়িতে আছে। জেলেরা জাতে মুসলমান, আরবি ভাষায় কথা বলে, তাই বোতল থেকে চিঠি বার করে পড়ার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

সেই চিঠি ক্যালেনবাখ বোতল থেকে বার করে পড়ে এবং পড়ার অল্পদিনের মধ্যেই তার কাজ সেরে চলে যায় লন্ডনে। সেখানে সন্ডার্সের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটা তাকে দেখায়। পেনসিলে লেখা মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি। সেটার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়–

ল্যাটিচিউড ৩৩° ইস্ট–লঙ্গিচিউড ৩৩৭ নর্থ ১৩
ডিসেম্বর ১৬২২
এই অজানা দ্বীপে আমরা এমন এক আশ্চর্য উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছি। যার অমৃততুল্য গুণ মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই সংবাদ প্রচারের জন্য ব্র্যান্ডনের নিষেধ সত্ত্বেও এ চিঠি আমি বোতলে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি। ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন এখন এই দ্বীপের অধীশ্বর। অতএব এই চিঠি পড়ে কোনও দল যদি এই উদ্ভিদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এখানে আসে, তারা যেন ব্র্যান্ডনের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে। আমি নিজে ব্র্যান্ডনের হাতের শিকার হতে চলেছি।
হেকটর মানরো

সন্ডার্স চিঠিটা পেয়ে প্রথমেই যে কাজটা করে, সেটা হল লন্ডনের নৌবিভাগের আপিসে গিয়ে ১৬২১-২২ সালে আটলান্টিক মহাসাগরে কোনও জাহাজ ডুবি হয়েছিল কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা। সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত অতি প্রাচীন দলিলও রাখা থাকে নৌবিভাগে। ১৬২২ সালের তিনটি জাহাজ ডুবির মধ্যে একটির যাত্রী-তালিকায় ডাঃ হেকটর মানরোর নাম পাওয়া যায়। এই জাহাজটি– নাম কংকুয়েস্ট–জিব্রালটার থেকে যাচ্ছিল আটলাণ্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে। বারমুডার কাছাকাছি এসে জাহাজডুবি হয়। কারণ জানা যায়নি। নৌবিভাগের রিপোর্টে বলছে কেউ বাঁচেনি; কিন্তু হেকটর মানরো যে বেঁচেছিল তার প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। তবে মানরোর চিঠিতে যে ব্র্যান্ডন ব্যক্তিটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, এই নামে কোনও যাত্রী কংকুয়েস্ট জাহাজে ছিল না। সন্ডার্স

অনুসন্ধান করে জানে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রেগ ব্র্যান্ডন নামে এক দুর্ধর্ষ জলদস্যু ছিল। ব্র্যান্ডনের নাকি একটা চোখ ছিল না; তার জায়গায় ছিল একটি গহ্বর। সেই কারণে তার নাম হয়ে গিয়েছিল ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন। সোনার লোভে এই ব্র্যান্ডন নাকি এক হাজারেরও বেশি মানুষ খুন করেছিল। জামাইকা দ্বীপ সেই সময়ে ছিল ইংরাজ জলদস্যুদের একটা প্রধান আস্তানা। এমন হতে পারে যে, কংকুয়েস্ট জাহাজ ব্র্যান্ডনের দস্যু-জাহাজের কবলে পড়ে এবং তার ফলেই ধ্বংস হয়। মানরো যে বেঁচেছে তার একটা কারণ হয়তো এই যে, ব্র্যান্ডনই তাকে বাঁচিয়েছে। এটা ভুললে চলবে না যে মানরো ছিল ডাক্তার। দস্যু-জাহাজে তখনকার দিনে একজন ভাল ডাক্তারের কদর ছিল খুব বেশি। সেকালে সমুদ্রযাত্রায় স্কার্ভি, পেল্যাগ্রা, বেরিবেরি ইত্যাদি ব্যারাম জাহাজে একবার দেখা দিলে নাবিকদের বাঁচবার আশা প্রায় থাকত না বললেই চলে। তাই একজন ভাল ডাক্তার– যিনি এইসব ব্যারামের চিকিৎসা করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার করতে পারবেনসে যুগে ছিল সমুদ্রযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। হেক্টর মোনরো নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে মানরো আর ব্র্যান্ডন শেষকালে এই অজানা দ্বীপে কীভাবে হাজির হয় তার কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

মোটকথা, এই সব তথ্য জেনে সন্ডার্সের রেখ চাপে সাড়ে তিনশো বছর পেরিয়ে গেলেও সে একবার এই অজানা দ্বীপে পাড়ি দেবে। আমাকে এ ব্যাপারে লেখামাত্র আমি অভিযানে যোগ দিতে রাজি হয়ে সাতদিনের মধ্যে লন্ডনে চলে আসি। এসে দেখি, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ক্যালেনবাখ অবিশ্যি প্রথমেই জানিয়ে রেখেছিল যে, অভিযান হলে সে তাতে যোগ দেবে। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম। সে টেলিভিশনের জন্য ছবি তুলে অনেক পয়সা রোজগারের স্বপ্ন দেখছে।

দলের চতুর্থ ব্যক্তি হলেন একজন জাপানি বৈজ্ঞানিক। এর নাম হিদেচি সুমা। এনার অনেক গুণের একটির পরিচয় আমার সামনেই সমুদ্রতটে বিরাজমান। এটি একটি জোঁটচালিত সমুদ্রযান। নাম সুমাক্রাফুট। এ যে কী আশ্চর্য জিনিস তা আমরা এই দেড়হাজার মাইল সমুদ্রপথে এসেই বুঝেছি। নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও এই

সুমাক্রাফট আমাদের একটিবারের জন্যও অসুবিধায় ফেলেনি। এই নৌকার ডিমনস্ট্রেশন দিতেই সুমা লন্ডনে এসেছিলেন, আর তখনই সন্ডার্সের সঙ্গে আলাপ হয়। সুমা শুধু এই জোঁটবোটের জনক নন। তাঁর তৈরি আরও অনেক ছোটখাটো যন্ত্রপাতি তিনি সঙ্গে এনেছেন যা তাঁর মতে আমাদের অভিযানে সাহায্য করবে। তা ছাড়া সুমা একজন প্রথম শ্রেণীর জীব-রাসায়নিক। সব শেষে আরও একটি বিশেষ গুণের কথা না বললে সুমার পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না : এনার মতো পরিপাটি ফিটফট মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। এঁকে যে কোনও সময় দেখলেই মনে হবে ইনি বুঝি তাঁর নিজের শহর ওসাকাতেই রয়েছেন, এবং এই মুহূর্তে ব্রিফকেসটি হাতে করে আপিসে রওনা দেবেন।

পঞ্চম ব্যক্তিটির নাম বলার আগে তিনি কীভাবে দলভুক্ত হলেন সেটা বলি।

সন্ডার্স এই অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েই লন্ডনের সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দলে যোগ দেবার জন্য লোক আহ্বান করে। যোগ্যতা হিসেবে পাঁচটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল। –এক, সমুদ্রযাত্রার পূর্ব অভিজ্ঞতা; দুই, অন্তত দুটি বৈজ্ঞানিক অভিযানে অংশগ্রহণের পূর্ব অভিজ্ঞতা; তিন, বিজ্ঞানের যে কোনও শাখায় একটি উচ্চমানের ডিগ্রি; চার, সুস্বাস্থ্য; পাঁচ, অস্ত্রচালনার অভিজ্ঞতা। আমাদের এই পাঁচ নম্বর ব্যক্তিটি শুধু প্রথম শর্তটি ছাড়া আর কোনওটিই পালন করতে পারেননি। ইনি বিজ্ঞানী নন, সাহিত্যিক; ইনি বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক কোনও অভিযানেই কখনও অংশগ্রহণ করেননি; কেবল ইস্কুলে থাকতে একবার দলে পড়ে স্কটল্যান্ডের বেন নেভিস পাহাড়ের গা বেয়ে দেড় হাজার ফুট উঠেছিলেন। বেন। নেভিসের উচ্চতা যেখানে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট, সেখানে এটাকে খুব বড় রকম কৃতিত্ব বলা চলে না। তবে এঁকে দলভুক্ত করার কারণ কী?

কারণ এই যে ডেভিড মানরো হল হেকটর মানরোর বংশধর। আমরা যে কথাটা প্রায়ই ব্যবহার করি, সেই চৌদ্দ পুরুষ পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে, হেক্টর মানরের সঙ্গে ডেভিড মানরোর সরাসরি সম্পর্ক। ডেভিড সন্ডার্সের বিজ্ঞাপন দেখে সোজা তার বাড়িতে এসে তাকে অনুরোধ করে এই অভিযানে তাকে সঙ্গে নেবার জন্য। সে বলে যে বাপঠাকুদরি কাছে সে শুনেছে। শেকসপিয়রের সমসাময়িক ডাঃ মনরোর কথা। ব্রিটিশ নৌবাহিনী যখন

স্প্যানিশ আরম্যাডাকে জলযুদ্ধে পরাজিত করে, তখন ব্রিটিশদের সেনাপতি ডিউক অফ এফিংহ্যামের নিজের জাহাজে ডাক্তার ছিলেন হেক্টর মানরো। তা ছাড়া ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত জেনে ডেভিডের আরও রোখি চেপে যায়। সে ছেলেবেলা থেকে জলদস্যুদের কাহিনী পড়ে এসেছে; এমনকী, ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডনকে ঘিরেও অনেক গল্প তার জানা। এই দ্বীপে যদি ব্র্যান্ডনের কোনও সিন্দুক থেকে থাকে, এবং তাতে যদি ধনরত্ন পাওয়া যায়, তা হলে ডেভিডের পক্ষে সেটা হবে এক অবিস্মরণীয় অ্যাডভেঞ্চার। এখানে বলা দরকার যে, ডেভিডের বয়স মাত্র বাইশ।

তরুণ ডেভিড মানরোকে দেখে তার স্বাস্থ্য এবং শ্রমক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে বাধ্য। তার হাত দেখলেই বোঝা যায়, সোহাত কলম ছাড়া আর কোনও হাতিয়ার ধরেনি। তার চোখের উদাস দৃষ্টি, তার মৃদুস্বরে কথা বলার ঢং, তার কাঁধ অবধি নেমে আসা অবিন্যস্ত সোনালি চুল, সবই প্রমাণ করে যে, তার কল্পনার জোর যতই হোক না কেন, তার শারীরিক বল সামান্যই। কিন্তু এই ডেভিডকেই সন্ডার্স শেষপর্যন্ত বেছে নিয়েছে, কারণ তার একটা গুণকে সে অগ্রাহ্য করতে পারেনি-ওই বোতলের চিঠি যার লেখা তার রক্ত বইছে ডেভিড মানরোর ধমনীতে।

এ ছাড়াও আরেকজন আছেন দিলে, তিনি হলেন একটি শ্বাপদ; ডেভিডের পোষা গ্রেটডেন কুকুর রকেট। আমাদের সকলের মধ্যে এরই স্বাস্থ্য যে সবচেয়ে ভাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমরা আজই সকলে এখানে এসে পৌঁছেছি। দিনে তিনশো মাইল পথ অতিক্রম করেও গত দুদিনে ডাঙার কোনও চিহ্ন দেখতে না পেয়ে সন্দেহ হচ্ছিল, আটলান্টিক মহাসাগরের এ অংশে আদৌ কোনও দ্বীপ আছে কি না। আজ ভোরে যখন দুরবিনে চোখ লাগিয়ে সন্ডার্স বলল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ডাঙা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ক্যালেনবাখ তৎক্ষণাৎ মুভি ক্যামেরা নিয়ে তৈরি। আমার অবাক লাগিছিল। এই কারণে যে, সচরাচর ডাঙা আসার অনেক আগেই সীগালের দল উড়ে এসে কর্কশ গলায় জানিয়ে দিয়ে যায় আসন্ন ভূখণ্ডের কথা। এবারে দেখলাম তার ব্যতিক্রম।

এখানে এসে বুঝছি, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আজ সারাদিন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ঘুরেও কয়েকটি পোকা এবং সমুদ্রতটে কিছু কাঁকড়া ছাড়া আর কোনও প্রাণীর সাক্ষাৎ পাইনি। শুধু তাই নয়; নতুন ধরনের কোনও উদ্ভিদও চোখে পড়েনি। এসব অঞ্চলে যেমন গাছপালা ফলমূল আশা করা যায়, তার বাইরে কিছুই দেখিনি। অবিশ্যি আজ আমরা দ্বীপের কেবলমাত্র পশ্চিম অংশের খানিকটা ঘুরে দেখেছি।

আমরা ক্যাম্প ফেলেছি। সমুদ্রতটের কাছেই। এটা দ্বীপের দক্ষিণ অংশ। এদিকটায় গাছপালা বিশেষ নেই; কেবল বালি আর পাথর। দ্বীপটাি আয়তনে ছোট, এবং মোটামুটি সমতল; কিন্তু মাঝখানের অংশটা–যেটা আমাদের ক্যাম্প থেকে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে– অপেক্ষাকৃত উঁচু, আর বেশ বড় বড় টিলায় ভর্তি।

ডেভিড বেশ ফুর্তিতে আছে, সমুদ্রতটে রকেটের সঙ্গে তার ছুটোছুটি দেখতেও ভাল লাগছে। লন্ডনে বা সমুদ্রযাত্রায় তার যা চেহারা দেখেছি, এখানে এসে এই কয়েক ঘণ্টাতেই যে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

গোলমাল করছে এক ক্যালেনবাখ। দ্বীপে পদার্পণমাত্র সে একনাগাড়ে ত্রিশটা হাঁচি দিল, আর তার পরেই এল কম্প দিয়ে জ্বর। বলা বাহুল্য আজ ওকে সঙ্গে নিতে পারিনি। সুমা আর ও ক্যাম্পেই ছিল। সুমা তার যন্ত্রপাতিগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখছে। আর সেইসঙ্গে একটি খুদে ল্যাবরেটরিও খাড়া করছে। নতুন কোনও উদ্ভিদ। যদি পাওয়া যায় তা হলে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে।

জ্বর সত্ত্বেও ক্যালেনবাখ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, আমরা দু-তিন দিনের মধ্যেই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাব। তার মতে এমন দ্বীপ নাকি সারা আটলান্টিক মহাসাগরে ছড়ানো।

আমি কিন্তু হেকটর মোনরোর চিঠির কথা ভুলতে পারছি না। ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড যখন মিলেছে তখন এই দ্বীপই সেই চিঠির দ্বীপ। এই দ্বীপেই মানরো সেই আশ্চর্য উদ্ভিদের পেয়েছিল।

১৩ই মার্চ, দুপুর বারোটা

কালেনবাখের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না। দু-একদিনের মধ্যে এ দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। ব্যাপারটা খুলে বলি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রে স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরোনোর আয়োজন করছি, এমন সময় ডেভিড হঠাৎ এসে বলল সে রকেটকে নিয়ে একটু একা ঘুরে আসতে চায়। তার সাহস যে বেড়েছে, সেটা কালকেই বুঝেছিলাম। আসলে সাহিত্যিক মানুষ তো, তার পক্ষে আমাদের মতো বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো বেশ কষ্টকর। আমরা এসেছি। সব কিছু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার জন্য, আর সেটার জন্য চাই সময় আর ধৈর্য। ডেভিড বলল, সে ওই দূরে টিলাগুলোর দিকে গিয়ে দেখতে চায় ওগুলোয় কোনও গুহাটুহা আছে কি না। তার ধারণা তার মধ্যে হয়তো ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডনের গুপ্তধন থাকতে পারে। আমি যাব। আর আধা ঘণ্টায় দেখে ঘুরে আসব, বলল ডেভিড।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, এইসব দ্বীপে বড় জানোয়ার না থাকলেও বিষাক্ত সাপ, বিছু ইত্যাদি থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। কাজেই তার পক্ষে এ কুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। ডেভিড তবুও মানতে চায় না; বলে, ক্যালেনবাখের পিস্তল আছে, সেটা সে সঙ্গে নিয়ে নেবে; তা ছাড়া রকেট আছে, সুতরাং ভয়ের কোনও কারণ নেই।

এই নিবোধ বালকের ছেলেমানুষি গোঁ কীভাবে নিরস্ত করা যায়। ভাবছি, এমন সময় শুনি–নো-নোনোনোনো!

সুমা বেরিয়ে এসেছে তার ক্যাম্প থেকে মাথা নাড়তে নাড়তে।

www.bengaliebook.com

নো–নোনোনোনো!

কী ব্যাপার? হাসি হাসি মুখের সঙ্গে এমন দৃঢ় নিষেধাজ্ঞা বেশ মজার লাগিছিল। সুমা হাত থেকে একটা ছোট যন্ত্রজাতীয় জিনিস বালির ওপর নামিয়ে রেখে বলল, দেয়ার ইজ সামথিং বিগ হিয়ার। সাম লিভিং থিং। ফাইভ পয়েন্ট সেভেন কিলোমিটারস ফ্রম হিয়ারওই দিকে।

সুমা হাত দিয়ে দূরে টিলাগুলোর দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর তার তৈরি আশ্চর্য যন্ত্রটা দেখাল। নাম দিয়েছে টেলিকর্ডিওস্কোপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরের প্রাণীর হৃৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। এর দৌড় দশ কিলোমিটার পর্যন্ত। প্রাণী ঠিক কোনদিকে কতদূরে আছে সেটা যন্ত্রের রিসিভারের মুখ আর সেই সঙ্গে একটি নব ঘুরিয়ে বোঝা যায়। দিক এবং দূরত্ব মিলে যাওয়ামাত্র যন্ত্রের মধ্যে শুরু হয়। হৃৎস্পন্দনের শব্দ, আর তারসঙ্গে তাল রেখে জ্বলতে নিভতে থাকে একটা রঙিন বাতি। দশ কিলোমিটারে বাতির রং হয় গাঢ় বেগুনি। প্রাণী কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে রং রামধনুর নিয়ম মেনে নীল সবুজ কমলা ইত্যাদি অতিক্রম করে, যখন প্রাণী এক কিলোমিটার দূরত্বে এসে পড়ে তখন লাল হয়ে জ্বলতে থাকে। সেইসঙ্গে অবিশ্যি হৃৎস্পন্দনের শব্দও বেড়ে যায়। প্রাণী এক কিলোমিটারের বেশি কাছে এসে পড়লে আর এ যন্ত্রে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

একই জায়গায় রয়েছে প্রাণীটা, বলল সুমা। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ইজ কোয়াইট বিগ।

বিগ মানে? কত বড়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মানুষের চেয়ে বড় বলেই মনে হয়। প্রাণীর আয়তন যত বড় হয় তার হৃৎস্পন্দন তত টিমে হয়। একজন সাধারণ মানুষের হার্টবিট মিনিটে সত্তরের মতো। এর দেখছি পঞ্চাশের একটু ওপরে।

কচ্ছপ হতে পারে কি? আমি জিজ্ঞেস করলাম। এসব অঞ্চলে কচ্ছপ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর অন্য যা বড় জানোয়ার থাকতে পারে, যেমন হরিণ বা বাঁদর, তার হৃৎস্পন্দনের রেট মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত।

যেভাবে এক জায়গায় চুপ করে পড়ে আছে, তাতে কচ্ছপ হতে পারে, বলল সুমা। কিন্তু সমুদ্র থেকে এত দূরে দ্বীপের মাঝখানে গিয়ে সে-কচ্ছপ কী করছে সেটা একটা প্রশ্ন বটে।

সন্ডার্স অবিশ্যি কচ্ছপের কথাটা উড়িয়েই দিল। তার বিশ্বাস এটা অন্য কোনও প্রাণী, এবং হয়তো দ্বীপের একমাত্র বড় প্রাণী। সুতরাং এ অবস্থায় ডেভিডকে কখনই একা বেরোতে দেওয়া চলে না।

আমরা আরও মিনিটখানেক এই শব্দ আর আলোর খেলা দেখার পর সুমা সুইচ টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করে দিল। আমি সুমার কৃতিত্বের তারিফ না করে পারলাম না। গ্রেটডেনের মতো কুকুর মানুষের অনেক আগেই বুঝতে পারে কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোনও প্রাণী আছে কি না; কিন্তু এই যন্ত্রের কাছে রকেটও শিশু।

আমরা সকলেই বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি, সমস্যা কেবল বিল ক্যালেনবাখকে নিয়ে। তার নিজের সঙ্গে আনা নানারকম ওষুধ খেয়েও কোনও ফল হয়নি। ফিরে এসে ওকে একটা মিরাকিউরলের বড়ি খাইয়ে দেব। আমার তৈরি এই ওষুধে এক সর্দি ছাড়া সব অসুখই একদিনের মধ্যে সেরে যায়। এখন বেচারা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কারণ দ্বীপে প্রাণী আছে জেনে ওর মনে আশার সঞ্চার হয়েছে হয়তো টেলিভিশন ক্যামেরাটা একেবারে মাঠে মারা যাবে না। সুমা আজও ক্যাম্পেই থাকবে। আর ঘণ্টাখানেক কাজ করলেই নাকি ওর খুদে ল্যাবরেটরিটা তৈরি হয়ে যাবে।

আমরা তিনজন রকেটকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাছাকাছির মধ্যে কোনও জানোয়ার এসে পড়লে রকেটই জানান দিয়ে দেবে, আর জানোয়ার যতক্ষণ না কাছে আসছে ততক্ষণ ভয়ের কোনও কারণ নেই।

আমাদের লক্ষ্য কিন্তু দ্বীপের মাঝখানের ওই টিলাগুলো নয়। ও অঞ্চলে গাছপালা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। আজ আমরা দ্বীপের পুব দিকটা ঘুরে দেখব। সমুদ্রের উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে গাছপালা বাড়তে শুরু করলেই উপকূল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকব। আমাদের তিনজনের সঙ্গেই অস্ত্র রয়েছে। সন্ডার্সের কাঁধে তার জামান মানলিখার রাইফল, ডেভিডের পকেটে ক্যালেনবাখের বেরেটা অটোম্যাটিক, আর আমার ভেস্টপকেটে অ্যানাইহিলিন বা নিশ্চিহ্নাস্ত্র। ক্যালেনবাখকে আমার এই যন্ত্রের কথা বলতে সে শাসিয়ে রেখেছে যে, ও সঙ্গে থাকলে যে কোনও জানোয়ারই আসুক না কেন, আমার অস্ত্রটি ব্যবহার করা চলবে না, কারণ যে জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার ছবি তোলা যাবে না।

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক হল যে, কেউ যদি দল ছেড়ে একটু এদিক ওদিক যেতে চায়, তা হলে তাকে ঘন ঘন ডাক ছেড়ে সে কত দূরে আর কোনদিকে আছে সেটা জানিয়ে দিতে হবে। দল ছেড়ে বেশিদূর যাওয়া অবশ্যই চলবে না। নিয়মটা অবিশ্যি ডেভিডের জন্যই, কারণ বেশ বুঝতে পারছি যে তার স্বাভাবিক উদাস, অলস ভাবটা কেটে গিয়ে তার জায়গায় একটা ছটফট ভাব দেখা দিয়েছে। এখন যেরকম জায়গা দিয়ে চলেছি তাতে কিছুটা দূরে সরে গেলেও চোখের আড়াল হবার উপায় নেই। কারণ বড় টিলা বা বড় গাছ জাতীয় কিছুই নেই কাছাকাছির মধ্যে।

একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে– সুমার যন্ত্র কেবল একটিমাত্র প্রাণীর কথা বলল; আরও প্রাণী আছে কি? যদি থাকে তারা কি সব দশ কিলোমিটারের বেশি দূরে রয়েছে? বোধ হয় না, কারণ আমার বিশ্বাস দ্বীপের আয়তন দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে দশ কিলোমিটারও নয়। দিন সাতেক ঘুরলেই এখানে যা কিছু দেখার সবই দেখা হয়ে যাবে।

উপকূল ধরে মাইলখানেক হাঁটার পর দৃশ্য পরিবর্তন হল। এবার সমুদ্রের ধার ছেড়ে দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকতে হবে। এখানে আমাদের বাঁয়ে– অর্থাৎ সমুদ্রের উলটো দিকে- প্রথমে বেঁটে পামগাছের জঙ্গল; তারপর ক্রমে সে জঙ্গল আরও ঘন হয়ে গিয়েছে। সেখানে কলা, পেঁপে, নারকেল ইত্যাদি গাছের পাশাপাশি আরও বড় গাছও রয়েছে। এদিকটায় পাথর আর নেই, আর পায়ের নীচে বালির বদলে রয়েছে। ঘাস আর আগাছা।

রকেট সমেট আমরা তিনজনে ঢুকলাম জঙ্গলের ভিতর। যেটা সত্যিই অবাক করে দিচ্ছে সেটা হল পাখির ডাকের অভাব। এমন নিস্তব্ধ বন– বিশেষ করে পৃথিবীর এই অংশে, যেখানে কাকাতুয়াই পাওয়া যায় অন্তত আট-দশ রকমের– আমি আর দেখিনি। তা ছাড়া এসব জঙ্গলে ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরীসৃপের চলাফেরারও একটা শব্দ প্রায়ই পাওয়া যায়, যেটা এখানে নেই। এ যেন এক অভিশপ্ত বন। গাছগুলো যে বেঁচে আছে, তাও হয়তো আর বেশিদিন থাকবে না।

আরও মিনিটদশেক হাঁটার পর জঙ্গলটা একটু পাতলা হল, আর তার কিছু পরেই একটা খোলা জায়গায় এসে আমাদের চারজনকেই থমকে থেমে যেতে হল। ডেভিড এগিয়ে ছিল, সে-ই প্রথমে একটা ভয় ও বিস্ময় মেশানো শব্দ করে থেমে গেল। আমরা এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তা এই–

জঙ্গলের মাঝখানে খোলা অংশটায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে জানোয়ারের হাড়, খুলি আর পাঁজরার অংশ। তার মধ্যে বেশ কষ্ট করে চিনতে পারা গোল দুটো হরিণ, গোটা চারেক গিরগিটি জাতীয় বড় সরীসৃপ–সম্ভবত ইগুয়ানা-আর বেশ কয়েক রকমের বাঁদর। হাড়গুলো যে বহুকালের পুরনো সেটা তাদের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।

তার মানে এ দ্বীপে এককালে জানোয়ার ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। এরা লোপ পেল কী করে সেটা জানার মতো তথ্য এখনও আমাদের হাতে নেই।

ডেভিড কিছুক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকার পর তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল।

দ্যাট মনস্টার!-ওই রাক্ষসই খেয়ে ফেলেছে এই সব জন্তুজানোয়ার।

বুঝতে পারলাম সুমার যন্ত্রে এই কিছুক্ষণ আগেই যে প্রাণীর হার্টবিট শোনা গেছে, ডেভিডের কল্পনায় এরই মধ্যে সেটা হয়ে গেছে রাক্ষস! অবিশ্যি এগুলো যে কেউ

খেয়েছে সেটা ভাববার সময় এখনও আসেনি; স্বাভাবিক মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জানোয়ার সব এক জায়গায় এসে মরবো কেন?

আমরা এগিয়ে চললাম।

সামনে একটা মেহগনি গাছের বন, তার মধ্যে কিছু সীডার গাছও রয়েছে, আর আশেপাশে ছড়িয়ে আছে জুই আর জবা জাতীয় ফুলগাছ, আর বুগেনভিলিয়া গাছ। মেহগনি গাছ আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এখানে এক একটার গুড়িতে একটা উজ্জ্বল নীলের ছোপ দেখছি যেটা আগে কখনও দেখিনি।

আরও কাছে যেতে বুঝলাম রঙের কারণ। রংটা গাছের নয়, গাছের গায়ে মৌমাছির চাকের মতো লেগে থাকা অজস্র ছোট ছোট ফলের মতো জিনিসের। আর সেইসঙ্গে গন্ধের কথাটাও বলা দরকার। এক অনির্বচনীয় সৌরভ ছেয়ে আছে বনের এই অংশটায়। কয়েক মুহুর্তের জন্য এই উদ্ভিদের আশ্চর্য রং ও গন্ধ আমাদের তিনজনকেই অনড় অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিল। মোহ কাটলে পর ছেলেমানুষ ডেভিড উল্লাসে দৌড়ে গিয়ে ফলে হাত দিতে যাচ্ছিল, আমি আর সন্ডার্স তাকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করলাম। তারপর সন্ডার্স রবারের দস্তানা পরে গাছের গায়ে হাত বুলোতেই ফলগুলো ঝুরঝুর করে আলগা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। আমরা প্লাসটিকের ব্যাগে প্রায় শ খানেক ফল ভরে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। সুমাকে দিয়ে অবিলম্বে এই ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করানো দরকার। এ জিনিস এর আগে আমরা কখনও দেখিনি। আমার মন বলছে এই ফলই মানরোর চিঠির সেই আশ্চর্য উদ্ভিদ। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ সেটা বোঝাই যাচ্ছে; মেহগনির গাছ থেকে রস টেনে নিয়ে এই উদ্ভিদ জীবনধারণ করে।

সুমার মিনিয়েচার ল্যাবরেটরি তৈরি, সে এরমধ্যেই নীল ডুমুরের রাসায়নিক বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছে। এটা জানতে পেরেছি যে, এই ফল হাতে ধরলে কোনও ক্ষতি নেই। ক্যালেনবাখের তাঁবুতে গিয়ে তাকে একটা ফল দেখিয়ে এসেছি। সে সেটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ। ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশের টেবিলে রেখে দিল। বুঝতে

www.bengaliebook.com

পারছি এই ফল আবিষ্কারের বিশেষ মুহূর্তটি সে টেলিভিশনে তুলে রাখতে পারেনি বলে তার আপশোস। আমি তাকে একটা মিরাকিউরলের বড়ি দিয়ে এসেছি। তাকে যে করে হোক চাঙা করে তুলতেই হবে। নিজের দেশের ওষুধ ছাড়া কিছুই খেতে চায় না। ক্যালেনবাখ, কিন্তু এখন বেগতিকে পড়ে রাজি হয়েছে।

১৩ই মার্চ, রাত নটা

বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে যে আমাদের অভিযান বিফল হবে না। এর পরিণতি কী হবে অনুমান করা অসম্ভব, কিন্তু যেভাবে ঘটনার মোড় ঘুরছে তাতে মনে হয় কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা দেশে ফিরতে পারব।

আজ লাঞ্চে ক্যালেনবাখকে শুধু একটু চিকেন সূপ খেতে দিলাম। তার নাড়ি বেশ দুর্বল। এই দুদিনের অসুখেই তার চেহারা দেখলে রীতিমতো ভাবনা হয়। অথচ এই অবস্থাতেও সে জানতে চাইল সেই প্রাণীটার কথা। তার দেখা পেয়েছি কি আমরা? সে প্রাণী কি আরও এগিয়ে এসেছে, না যেখানে ছিল সেখানেই আছে?

টেলিকার্ডিওস্কোপ যন্ত্র অবিশ্যি আপাতত বন্ধই আছে। সুমা এখন একাগ্রমনে চালিয়ে এগিয়ে চলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে ওই ফলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ। তার কাজ যে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে মাঝে মাঝে তার হুংকার থেকে। আর আর সন্ডার্স উদগ্রীব হয়ে দেখছি সুমার গবেষণা। যে প্রক্রিয়াটা চোখের সামনে ঘটছে সেটা আমাদের অজানা নয়। এই ফলে যে ক্রমে ক্রমে সমস্তরকম ভিটামিনের অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা দেখতেই পাচ্ছি। মানরোর যুগে ভিটামিন কথাটাই তৈরি হয়নি। বিজ্ঞান তখন শিশু, আর খাদ্যদ্রব্যের চর্চা শুরু হতে তখনও আড়াইশো বছর দেরি।

সাড়ে তিনটের সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে সুমা কেবল দুটি কথাই বলল। প্রথমে বলল অ্যামেজিং, আর তারপরে তার পকেটের রুমালটাকে সিকি ইঞ্চি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল অ্যান্ড মিসটিরিয়াস।

www.bengaliebook.com

ইতিমধ্যে ক্যালেনবাখ যে কখন তার বিছানা ছেড়ে উঠে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা বুঝতেই পারিনি। তার দিকে চোখ পড়তে সে হাত বাড়িয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, গ্রেট! তোমার ওষুধের কোনও তুলনা নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ!

সে কী? এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই?

দেখতেই তো পাচ্ছ, হেসে বলল বিল ক্যালেনবাখ।

আমার ওষুধ যে এমন অসম্ভব দ্রুত গতিতে অসুখ সারাতে পারে সেটা আমি নিজেও জানতাম না।

আর এই নাও– এটা আমার টেবিলের উপর ছিল।

সে কী! এ যে আমারই ওষুধের বড়ি!

রহস্য সমাধান হতে সময় লাগল না। জ্বরের ঘোরে। আমার বড়ি না খেয়ে ক্যালেনবাখ খেয়েছে টেবিলে রাখা সেই নীল ফলটি। আর তাতেই এই আশ্চর্য আরোগ্য লাভ। আর ফলের গুণ যে শুধু আরোগ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে তা নয়; ক্যালেনবাখের চাহনিতে এই দীপ্তি এর আগে কখনও দেখিনি। সন্ডার্স সুমাকে বলল, তোমার গবেষণার আর কোনও প্রয়োজন নেই; এখন এই ফল যত পারা যায় সঙ্গে নিয়ে চলো দেশে ফিরে যাই। এর চাষ করে আমরা সব ডাক্তারি কোম্পানিকে ফেল করিয়ে দেব!

কথাটা সন্ডার্স রসিকতা করে বললেও সুমা জবাব দিল অত্যন্ত গভীরভাবে। সে বলল যে তাকে এখনও গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। অন্তত আরও একটা দিন। ভিটামিনের বাইরেও আরও অনেক কিছু রয়েছে এই ফলের মধ্যে, যেগুলোর নাগাল ও এখনও পায়নি।

www.bengaliebook.com

ক্যালেনবাখের পীড়াপীড়িতেই সুমাকে তার কাজ বন্ধ করে টেলিকর্ডিওস্কোপটা চালু করতে হল। দেখা গেল প্রাণীটা ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বাট হিজ হার্টবিট ইজ স্লোয়ার, বলল সুমা।

সে তো শব্দ শুনেই বুঝতে পারছি। কাল ছিল পঞ্চাশ, আর আজ চল্লিশের নীচে।

সর্বনাশ! বলে উঠল ক্যালেনবাখ। এ কি মরে যাবে নাকি? এমন একটা প্রাণী এই দ্বীপে থাকতে তোমরা ওই ফলের পিছনে সময় নষ্ট করছ?

ফল তো পেয়েই গেছি, বিল, বলল সন্ডার্স। আমরা কালই দ্বীপের মাঝের অংশটার দিকে যাব। তুমি অসহিষ্ণু হয়ে না।

ক্যালেনবাখ তাও গজগজ করতে করতে তার ক্যাম্পের দিকে চলে গেল।

১৪ই মার্চ

আজ আর আমাদের বেরোনো হল না। সারাদিন ঝড় বৃষ্টি বাজপাত। ক্যালেনবাখ অগত্যা তার ক্যামেরা দিয়ে আমাদেরই ছবি তুলল, আর টেপ রেকডারের সাহায্যে আমাদের সকলের ইন্টারভিউ নিল।

দুপুরে লাঞ্চের পর ডেভিড আমাদের সকলকে জলদস্যুদের গল্প শোনাল। সত্যি, ছেলেটার আশ্চর্য স্টক আছে এই সব গল্পের।

একটা দুঃসংবাদ এই যে, সুমা বলল, ফলে ভিটামিন ছাড়া আর যাই থাক না কেন, সেটা এই খুদে ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে বার করা সম্ভব না। সে কাজটা দেশে ফিরে গিয়ে বড় ল্যাবরেটরিতে করতে হবে। অবিশ্যি আমাদের এখানে আসার পিছনে যে প্রধান উদ্দেশ্য সে তো সফলই হয়েছে। কাজেই দেশে ফিরে যেতেও আর বেশি দিন বাকি নেই। আপাতত সুমা আমাদের এই ফল খেতে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে। একটা ফলেই যদি ক্যালেনবাখের কঠিন ব্যারাম এক ঘণ্টার মধ্যে সারতে পারে তা হলে এই ফলের

তেজ যে কী রকম সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। সুমার মতে এই ফল খেলে উপকারের সঙ্গে অনিষ্টও হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। বিস্ময়কর রকম ক্ষুধাবৃদ্ধিটা অপকার কি না জানি না, কিন্তু ক্যালেনবাখ আজ লাঞ্চে একই তিন টিন হ্যাম খেয়ে ফেলেছে।

১৫ই মার্চ, সকাল সাতটা

দুঃসংবাদ।

ক্যালেনবাখ একা বেরিয়ে পড়েছে কাউকে কিছু না বলে।

ডেভিড মানরোই খবরটা দিল আমাদের। সে আর ক্যালেনবাখ একই তাঁবুতে রয়েছে, অন্য দুটোর একটাতে আমি আর সন্ডার্স, আরেকটাতে তার যন্ত্রপাতি সমেত সুমা। ডেভিড সাড়ে ছটায় ঘুম ভেঙে দেখে ক্যালেনবাখের বিছানা খালি, এবং টেবিলের উপর তার ক্যামেরার যে সরঞ্জাম ছিল সেগুলোও নেই। তৎক্ষণাৎ তাঁবুর বাইরে এসে ডেভিড বারকয়েক ক্যালেনবাখের নাম ধরে ডাক দেয়। কিন্তু কোনও সাড়া পায় না। অবশেষে তার কুকুর রকেটের সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যালেনবাখের বালিশের পাশে পড়ে থাকা রুমালটা নিয়ে রকেটকে শোকায়। যখন দেখে যে রকেট সেই দূরের টিলাগুলোর দিকে ধাওয়া করেছে, তখন আবার তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনে।

সুমা সারারাত কাজ করে সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল; তাকে তুলে খবরটা দেওয়া হয়। সে তৎক্ষণাৎ তার টেলিকর্ডিওস্কোপ চালু করে হলদে বাতির স্পন্দন দেখিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, ক্যালেনবাখ ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রয়েছে এবং ওই টিলাগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রওনা দেব। আজ দিন ভাল। আজ চার জনেই যাব। সন্ডার্সের আক্ষেপের শেষ নেই; বারবার বলছে, কী কুক্ষণেই না বেপরোয়া লোকটাকে সঙ্গে এনেছিলাম।

১৫ই মার্চ, বিকেল সাড়ে পাঁচটা

একসঙ্গে এতগুলো চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে মাথার মধ্যেটা কেমন যেন, সব ওলট পালট হয়ে যায়।

আমরা এখন দ্বীপের মধ্যিখানের সেই প্রস্তরময় টিলা অঞ্চল থেকে পুবে প্রায় দু কিলোমিটার এসে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসেছি। সন্ডার্স তার খাতায় নোট লিখছে। লন্ডনের তিনটে দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে সে চুক্তিবদ্ধ আমাদের এই অভিযান সম্পর্কে লেখার জন্য। এখানে এসে এই প্রথম সে খাতা খুলল।

ক্যালেনবাখকে পাওয়া যায়নি; শুধু পাওয়া গেছে তার ক্যামেরার বাক্স আর টেপ রেকডার। দুটোরই অবস্থা বেশ শোচনীয়। মুভি ক্যামেরাটা তার কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা থাকে; সে যদি সেই অজ্ঞাত প্রাণীর কবলে পড়ে থাকে তা হলে ক্যামেরা সমেতই পড়েছে।

ডেভিড সুমার কাছ থেকে তার জাপানি মিকিকি রিভলভারটা চেয়ে নিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর নুড়ি পাথর রেখে তার টিপ পরীক্ষা করে চলেছে। রকম দেখে মনে হচ্ছে আর দিনতিনেক অভ্যাস করলেই তার নিশানা জবরদস্ত চেহারা নেবে।

সুমা সমুদ্রতটে পায়চারি করছে। গুনে গুনে চল্লিশ পা এদিকে, চল্লিশ পা ওদিকে। আট ঘণ্টা ভ্রমণের পরও তার কাপড়ে একটি ভাঁজ পড়েনি, মাথার একটি চুলও এদিক ওদিক হয়নি।

তার কাঁধ থেকে যে চামড়ার ব্যাগটা ঝুলছে, তাতে রয়েছে তারই তৈরি এক আশ্চর্য অস্ত্র। এর নাম সুমগান। লম্বায় এক হাত, ঘোড়ার বদলে রয়েছে একটা বোতাম, যেটা টিপলে গুলির বদলে বেরিয়ে আসে ছুচ লাগানো একটা ক্যাপসুল, যার ভিতরে রয়েছে সুমারই তৈরি এক মারাত্মক বিষ। এই ক্যাপসুল যে কোনও প্রাণীর যে কোনও অংশে প্রবেশ করলে তিন সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু।

এবারে আমাদের আশ্চর্য আবিষ্কারগুলোর কথা বলি। প্রথম আবিষ্কার হল এই যে এ দ্বীপে যে ব্র্যান্ডন ও মানরো ছাড়া আরও মানুষ ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি। একটা গুহার মধ্যে

www.bengaliebook.com

ছড়ানো কিছু কঙ্কাল, আর বেশ কিছু গেলাস, বোতল, ছুরি, কানের মাকড়ি ইত্যাদি ধাতুর ও কাচের জিনিস থেকে। মনে হয় ব্র্যান্ডনের জাহাজের সবাই এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল। জলদস্যুরা যে ধরনের তলোয়ার বা কটল্যাস ব্যবহার করত, সে রকম কাটল্যাস পেয়েছি বাইশটা। দুঃখের বিষয় কোনও সিন্দুক পাওয়া যায়নি। তবে এ রকম গুহা এ দিকটায় অনেক আছে; তার কোনটার মধ্যে কী রয়েছে কে জানে?

আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মিনিটদশেক পরিভ্রমণের পরেই রকেটের গর্জন শুনে এক জায়গায় গিয়ে দেখি ক্যালেনবাখের ক্যামেরার বাক্স আর টেপ রেকডার পড়ে আছে। মনে হয় ও জিনিস দুটোকে ফেলে হালকা হয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। তারপরে সে রক্ষা পেয়েছে কি না সেটা অবিশ্যি জানা যায়নি। ওখানে থাকতেই সুমাকে বলে টেলিকর্ডিওস্কোপ চালু করেছিলাম। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। আমাদের চেনা প্রাণী ছাড়া আর কোনও প্রাণীর হৃৎস্পন্দন পাওয়া যায়নি রিসিভারের মুখ চারিদিকে ঘুরিয়েও। এক যদি ক্যালেনবাখ এক কিলোমিটারের মধ্যে থেকে থাকে তা হলে আলাদা কথা; কিন্তু সেখানে থেকে সে করছেটা কী? সে কি জখম হয়ে পড়ে আছে? তার কাছে পিস্তল আছে; তার একটা ফাঁকা আওয়াজ করেও তো সে তার অস্তিত্বটা জানিয়ে দিতে পারে। প্রাণীটার হৃৎস্পন্দনের গতি আবার পঞ্চাশে ফিরে গেছে। আলোর রং হলদে আর সবুজের মাঝামাঝি; অর্থাৎ প্রাণীটা রয়েছে। এখান থেকে তিন কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরে।

ক্যালেনবাখের জিনিসদুটো নিয়ে আমরা এখানে চলে আসি বিশ্রাম আর কফির জন্য। এখানে এসেই সুমা প্রথমে যে জিনিসটা করল সেটা হল ক্যালেনবাখের তোবড়ানো টেপ রেকর্ডারটাকে বালির উপর রেখে সেটাকে চালু করা। দিব্যি চলল। জাপানি জিনিস বলেই বোধ হয় সুমার মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি। আমরা যন্ত্রটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদে ক্যালেনবাখের গলা শুনলাম।

দিস ইজ বিল ক্যালেনবাখ। ১৪ই মার্চ, সকাল আটটা দশ। আমার একক অভিযান সার্থক হয়েছে। আমি এইমাত্র প্রাণীটির দেখা পেয়েছি। আমার সামনে আন্দাজ পঞ্চাশ গজ দূরের

গুহাটা থেকে সে বাইরে এসেছিল। মানুষের চেয়ে বড়। মনে হয় চতুষ্পদ। যদিও মাঝে মাঝে দু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে। আমি গাছের আড়ালে থাকায় আমাকে দেখতে পায়নি। ক্যামেরায় টেলিফোটো লেনাস লাগানোর আগেই প্রাণীটা আবার গুহায় ফিরে যায়। দূর থেকে দেখে তেমন ভয়াবহ কোনও জানোয়ার বলে মনে হল না। হাঁটার গতি দেখে মনে হচ্ছিল অসুস্থ, কিংবা জরাগ্রস্ত। আমি খুব সন্তর্পণে গুহার দিকে এগোচ্ছি।

এইখানেই বক্তব্য শেষ।

এবার আমাদের ফেরার সময় হয়েছে। কাল কী আছে কপালে কে জানে!

১৬ই মার্চ, সকাল সাড়ে ছটা

ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

কাল রাত আড়াইটায় রকেটের মুহুর্মুহু গর্জন আর সেইসঙ্গে ডেভিডের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি রকেট উত্তর দিকে মুখ করে গর্জন করে চলেছে এবং সেইসঙ্গে ডেভিডের হাতে ধরা লাগামে প্রচণ্ড টান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। অমাবস্যার রাত, তার উপর আকাশে মেঘ, কাজেই রকেটের এই অস্থিরতার কারণ জানা গেল না। সন্ডার্স তাঁবুতে ঢুকেছিল। টর্চ আনতে কিন্তু তার আগেই রকেট ডেভিডকে টান মেরে বালির উপর ফেলে দিয়ে অন্ধকারে ছুটি লাগাল উত্তর দিক লক্ষ্য করে। সুমা ইতিমধ্যে টেলিকর্ডিওস্কোপ চালু করেছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল পাওয়া গেল না। সে প্রাণী যদি এসে থাকে তো এক কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, টর্চ ফেলেও কিছু দেখা যাচ্ছে না, কারণ, একটি ছোট টিলার পিছনে রকেট অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদেরও এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করা উচিত কি না ভাবছি এমন সময় রকেটের চিৎকারে আমাদের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ চিৎকার আস্ফালন বা আক্রোশ নয়। এ হল আর্তনাদ।

www.bengaliebook.com

এবার টর্চের আলোয় দেখা গেল রকেট ফিরে আসছে। ডেভিড ছুটে এগিয়ে গেল তার প্রিয় কুকুরের দিকে। আমরাও ছুটলাম তার পিছু পিছু। গিয়ে দেখি আর্তনাদের কারণ স্পষ্ট; রকেটের পিঠে গভীর ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, প্রাণীটি শুধু জখম করেননি, নিজেও জখম হয়েছেন; রকেটের মুখে লেগে রয়েছে তার রক্ত।

রকেটের ক্ষতে যে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে সে কালকের মধ্যেই সেরে উঠবে।

রকেটের মুখের রক্ত পরীক্ষা করে সুমা জানিয়েছে রক্তের গ্রুপ হল এ। এ গ্রুপের রক্ত যেমন মানুষের হয়, তেমনই অনেক শ্রেণীর বাঁদরেরও হয়। প্রাণীটি যে বানর শ্রেণীর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আধা ঘণ্টা আগে গিয়ে তার পায়ের ছাপ দেখে এসেছি বালির উপর, আমাদের ক্যাম্প থেকে পঞ্চাশ গজ। উত্তরে। পায়ের ছাপের সামনে রয়েছে মুঠো করা হাতের ছাপ। পায়ের পাঁচটা আঙুল, সাইজে মানুষের পায়ের চেয়ে সামান্য বড়।

আজকের অভিযানে এই হিংস্র জীবটির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যে দ্বীপে এই অমৃতসদৃশ ফল, সেই একই দ্বীপে এই রাক্ষুসে বানরের বিভীষিকাময় কার্যকলাপ আমাদের সকলেরই মনে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করেছে।

১৭ই মার্চ, রাত নটা

কাল সকলে আমরা ফিরে যাচ্ছি। মনের অবস্থা বর্ণনা করে লাভ নেই, কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতার পরে সুখদুঃখ বিস্ময় ইত্যাদি মামুলি শব্দ ব্যবহার করে সে বর্ণনা সম্ভব নয়। আসলে এটা আমি লক্ষ করেছি যে আমার কোনও অভিযানই সম্পূর্ণ সফল বা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না; যেমন চমকপ্রদ লাভও হয়, তেমনই আবার অপূরণীয় ক্ষতিও হয়। এবারের অভিযান সম্পর্কে একটাই সত্যি, কথা বলা যায় যে, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিস্ময়ের ভাণ্ডার—এ সবই আরও পরিপূর্ণ হয়েছে।

কাল যেখানে ক্যালেনবাখের ক্যামেরার ব্যাগ আর টেপ রেকর্ডার পাওয়া গিয়েছিল, আজ সেখানে ফিরে গিয়ে সুমা টেলিকর্ডিওস্কোপ চালু করে দিল। আজও কেবল একটিমাত্র প্রাণীরই হৃৎস্পন্দন পাওয়া গেল। যন্ত্রে। স্পন্দনের রেট মিনিটে পঞ্চাশ, আর বাতির রং কমলা। প্রাণী আমাদের পশ্চিমদিকে দুই পয়েন্ট চার কিলোমিটার দূরে রয়েছে। কিন্তু সে এক জায়গায় থেমে নেই, কারণ সুমাকে বার বার রিসিভারের মুখ ঘোরাতে হচ্ছে। প্রাণীটা যে দ্রুতগামী নয়, সেটা ক্যালেনবাখের বর্ণনা থেকেই আমরা জেনেছি, সুতরাং সে যদি আমাদের দিকে আসেও, অন্তত আধা ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে আছে আরেকটু ঘুরে দেখার জন্য। ক্যালেনবাখ যে মরে গেছে একথা এখনও কিছুতেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। হয়তো সে কোথাও গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়ে আছে, এবং এক কিলোমিটারের মধ্যেই আছে বলে যন্ত্রে তার হৃৎস্পন্দন শোনা যাচ্ছে না।

কিন্তু আমাদের এ আশা নির্মমভাবে আঘাত পেল দশ মিনিটের মধ্যেই। একটা পয়েনসেটিয়া ফুলের ঝোপের পেছনে ক্যালেনবাখের মৃতদেহ আবিষ্কার করল জেরেমি সন্ডার্স। দেহ বলতে পুরো দেহ নয়; নীচের দিকের বেশ কিছুটা অংশ নেই। সেটা যে এই রাক্ষুসে। প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়েছে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্যালেনবাখের মুভি ক্যামেরা এখনও তার কোমরে স্ট্র্যাপ বাঁধা রয়েছে, তার লেনাস ভেঙে চুরমার, তার সবাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু তাও সেটা রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমাদের জাপানি বন্ধুটির প্রতিক্রিয়া দেখে। মে বি ইন্টারেস্টিং ফিল্ম বলে সে ক্যামেরাটা ফিল্মসমেত খুলে নিল মৃতদেহ থেকে। আমরা এই বীভৎস অথচ করুণ দৃশ্য আর দেখতে পারলাম না। ক্যালেনবাখকে গোর দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু সেটা এখন নয়; এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সামনের ওই গুহাটার কথাই কি বলেছিল ক্যালেনবাখ? একটা বেশ বড় টিলার গায়ে অন্ধকার গহ্বরটা আমাদের সকলেরই চোখে পড়েছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের ক্যাম্প থেকে এই অংশটাকে দেখে মনে হয় যে এখানে পাথর ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু কাছে এসে বুঝেছি যে, ফাঁকে ফাঁকে গাছও আছে। তবে এটাও আমরা বুঝেছি যে, সেই আশ্চর্য ফল সম্ভবত দ্বীপের ওই একটি বিশেষ জায়গায় ছাড়া আর কোথাও নেই।

গুহাটার কাছাকাছি পৌঁছে ডেভিড আমাদের ছেড়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে আগেই তার ভিতরে প্রবেশ করল। গুহার লোভ ডেভিড সামলাতে পারে না। এ কদিনে যতগুলো ছোট বড় গুহা আমাদের পথে পড়েছে, তার প্রত্যেকটিতে ডেভিড হাতে টর্চ নিয়ে ঢুকে তার ভিতরটা একবার বেশ ভাল করে দেখে এসেছে। এটা অবিশ্যি সে করে চলেছে গুপ্তধনের আশায়। অবশেষে আজকে যে তার আশা পূরণ হবে সেটা কি সে নিজেও ভেবেছিল?

ইয়ো হো হো বলে যে চিৎকারটায় সে তার আবিষ্কারের কথাটা আমাদের জানিয়ে দিল, এটা হল খাঁটি জলদস্যুদের চিৎকার। শুনে মনে হল বুঝি বা ডেভিডের দেহে মোনরোর নয়, ব্র্যান্ডনের রক্ত বইছে।

চিৎকারের কারণটা অবিশ্যি একেবারে খাঁটি। পাইরেটের সিন্দুকের চেহারা আমাদের সকলেরই চেনা। ঠিক তেমনই একটি সুপ্রাচীন সিন্দুক রাখা রয়েছে গুহার এক কোণে। বাইরে থেকে বোঝা যায়নি এ গুহার ভিতরটা এত বড়। এতে অন্তত একশোজন লোকের থাকার জায়গা হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে ব্র্যান্ডনের দাসুরা যে সব গুহা ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান।

ডেভিড সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধ ডালাটার দিকে একদৃষ্টি চেয়ে। সে এগিয়ে গেছে ডালা খোলার জন্য, কিন্তু কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন তার হাতদুটোকে পাথর করে রেখেছে। s

চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সুমা অবিশ্যি তৎক্ষণাৎ তার ডান হাতের তর্জনীর ডগাটা দিয়ে ডেভিডের কপালের ঠিক মাঝখানে তিনটে টোকা মেরে তৎক্ষণাৎ তার জ্ঞান ফিরিয়ে দিল। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে ডেভিডের মূর্ছা যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তার

ছেলেবেলার সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে; সিন্দুক বোঝাই হয়ে রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রা; ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডনের লুষ্ঠিত ধন।

ইতিমধ্যে আরেকটি আবিষ্কার আমাদের মধ্যে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এটিও একটি তোরঙ্গ–যদিও আগেরটার চেয়ে ছোট। এর গায়ে তামার পাতের অক্ষরে এখনও লেখা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে–ডাঃ এইচ মানরো।

এই তোরঙ্গ খুলে তার ভিতর থেকে জীর্ণ জামাকাপড় আর কিছু ডাক্তারির জিনিসপত্র ছাড়া একটি আশ্চর্য মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল– হেকটর মোনরোর ডায়রি। ডায়রি শুরু হয়েছে এই দ্বীপে এসে নামার পরদিন থেকে। মানরো কীভাবে এখানে এলেন সে খবরও এই ডায়রিতে আছে। আমাদের অনুমান একেবারে ভুল হয়নি। কংকুয়েস্ট জাহাজ জলদস্যুদের হাতে পড়ে জলমগ্ন হয়। মোনরোকে ব্র্যান্ডনই উদ্ধার করে তার নিজের জাহাজে তোলে। তারপর তারা রওনা দেয় জামাইকা। পথে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়তে হয়। জাহাজকে। দিগভ্রম হয়ে জাহাজ ভুল পথে চলতে শুরু করে। এই সময় নাবিকদের মধ্যে ব্যারাম দেখা দেয়। সাতদিন পরে এই অজানা দ্বীপের কাছে এসে জাহাজ ডুবি হয়। ব্র্যাে ন্ডন আর মানরো ছাড়া আরও তেত্রিশজন লোক কোনওমতে ডাঙার নাগাল পেয়ে আত্মরক্ষা করে। র্যাগাল্যান্ড নামে একজন নাবিক ঘটনাচক্রে ওই নীল ফলের সন্ধান পায়। র্যাগাল্যান্ড তখন অসুস্থ। এই ফল খেয়ে সে এক ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্যলাভ করে। তারপর এই ফল খেয়ে দলের সকলেরই ব্যারাম ম্যাজিকের মতো সেরে যায়। মানরো এই ফলের নাম দিয়েছিল অ্যামব্রোজিয়া অর্থাৎ অমৃত। এই দ্বীপের জানোয়ার আর পাখিও এই ফল খায় কি না সে প্রশ্ন মানরোর মনে জেগেছিল। সে লিখছে–

আর কোনও জানোয়ার না হোক, বাঁদর যে খায় সেটা আমি বুঝেছি তাদের স্বাস্থ্য ও ক্ষিপ্রতা দেখে। শুধু তাই না; এখানকার বাঁদরগুলো উদ্ভিদজীবী নয়, এরা মাংস খায়। আমি এদের গিরগিটি আর ব্যাঙ ধরে খেতে দেখেছি।

মানরোর এ কথা বলার কারণ তার নিজের পরের কথাতেই পরিষ্কার হচ্ছে। সে সুস্থ অবস্থাতেই এ ফল খেয়ে দেখে লিখছে–

আমি আজ অমৃতের স্বাদ পেলাম। অবিশ্বাস্য এই ফলের ক্ষুধাবৃদ্ধিশক্তি। আজ সকালে আমরা অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে হরিণের মাংস খেলাম। ফলমূলের অভাব নেই এখানে, কিন্তু তাতে ক্ষুধা মেটে না। এই আশ্চর্য ফল কি এই অজানা দ্বীপেই থেকে যাবে? পৃথিবীর লোক কি এর কথা জানতে পারবে না?

এর পরে ইঙ্গিত আছে, ডাক্তারের আর প্রয়োজন নেই দেখে ব্র্যান্ডন মানরোকে সরাবার চেষ্টা করছে। আত্মরক্ষার জন্য মানরো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে ব্র্যান্ডনের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। এদিকে খাদ্যসমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। দ্বীপের হরিণ মারা শেষ করে ব্র্যান্ডনের দাসুন্দল পাখি বাঁদর ইত্যাদি শিকার করে খাচ্ছে। ফলমূল শাকসবজিতে আর কারুর রুচি নেই।

সব শেষে মনরো যে কথাটা বলেছে সেটা পড়ে আমাদের মনে এক অদ্ভুত ভাব হল। সে লিখছে :

আমি বোতলে চিঠি পাঠিয়ে ঠিক করলাম কি না জানি না। এই ফলকে অমৃত বলা উচিত কি না সে বিষয়েও আমার মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই তিন মাসের মধ্যে মানুষগুলো সব পশুতে পরিণত হতে চলেছে। আমিও কি পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছি? এই যে চিরকালের জন্য রোগমুক্তি, আর তার সঙ্গে এই যে অদম্য ক্ষুধা, এটা কি মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর?

মানরের ডায়রিটা শেষ করে আমরা সকলেই মন ভার করে গুহার মধ্যে বসে আছি। এমন সময় খেয়াল হল যে একবার টেলিকডিওস্কোপটা চালিয়ে দেখা উচিত।

সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্র চালু করা হল, কিন্তু কোনও ফল পাওয়া গেল না। তার মানে প্রাণীটা এক কিলোমিটারের মধ্যে চলে এসেছে।

ঠিক এই সময় আমিই প্রথম অনুভব করলাম গুহার ভিতরে একটা গন্ধ যেটা এতক্ষণ পাইনি। আমরা গুহার মুখটাতেই বসেছিলাম। বাইরের আলোতে মানরের ডায়রিটা পড়ার সুবিধা হবে বলে। গন্ধটা কিন্তু আসছে গুহার ভিতর থেকেই, আর সেটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার মানে গুহার ভিতরে পিছন দিকেও একটা ঢোকার রাস্তা আছে। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে প্রাণীটা, কারণ পায়ের শব্দ পাচ্ছি না এখনও।

এবারে একটা মৃদু শব্দ। একটা প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হল। পরমুহূর্তে একটা রক্ত হিম করা হুংকারের সঙ্গে অন্ধকার থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একটা পাথরের খণ্ড এসে পড়ল সন্ডার্সের মাথায়। সন্ডার্স একটা গোঙানির শব্দ করে সংজ্ঞা হারিয়ে গুহার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, আর আমাদের অবাক করে দিয়ে ডেভিড মানরো সন্ডার্সের হাত থেকে পড়ে যাওয়া দোনলা বন্দুকটা তুলে নিয়ে সেই অন্ধকারের দিক লক্ষ্য করেই পর পর দুটো গুলি চালিয়ে দিল।

এবারে বাইরে থেকে আসা ফিকে আলোতে দেখলাম প্রাণীটাকে, আর শুনলাম তার মর্মভেদী আর্তনাদ। সে চার পা থেকে দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুটো লোমশ হাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে। আমি আমার অ্যানাইহিলিনটা বার করার আগেই একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে সুমাগানের একটা বিষাক্ত ক্যাপসুল প্রাণীটির বুকে গিয়ে বিধল, আর মুহুর্তের মধ্যে সেটা নির্জীব অবস্থায় চিত হয়ে পড়ল। গুহার মেঝেতে।

এই প্রথম সুমাকে উত্তেজিত হতে দেখলাম। সে চিৎকার করে বলে উঠল, ওই ফলের বিশেষ গুণটা কী এবার বুঝে দেখো শঙ্কু। আমি বুঝেছিলাম, আর তাই তোমাদের খেতে নিষেধ করেছিলাম। এই ফল যে একবার খাবে এক অনাহার বা অপঘাত মৃত্যু ছাড়া তার আর মরণ নেই। এই প্রাণী একা এই দ্বীপের অন্য সমস্ত প্রাণীকে ভক্ষণ করে অবশেষে খাদ্যের অভাবে মরতে বসেছিল, ক্যালেনবাখকে খাদ্য হিসেবে পেয়ে তার মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। এখন তার খিদে চিরকালের জন্য মিটে গেছে!

www.bengaliebook.com

এই বলে সুমা তার বাঁ হাতের কবজিটা প্রাণীটার দিকে ঘুরিয়ে হাতঘড়ির বোতামটা টিপতেই ঘড়ির কেন্দ্রস্থল থেকে একটা তীব্র রশ্মি বেরিয়ে প্রাণীটার মুখের উপর পড়ল।

যাকে মৃত অবস্থায় দেখছ তোমরা, বলল সুমা, তার বয়স ছিল চারশেরও বেশি।

ব্ল্যাকহোল ব্র্যান্ডন?–গুহা কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল। ডেভিড মানরো।

সন্ডার্সের জ্ঞান হয়েছে। আমরা চারজন চেয়ে আছি মৃত প্রাণীটির দিকে। এই দীর্ঘকায় লোমশ জানোয়ারকে আর মানুষ বলে চেনার উপায় নেই, কিন্তু এর ডান চোখের জায়গায় যে গভীর গর্তটা সুমার টর্চের আলোতে আরও গভীর বলে মনে হচ্ছে, সেটাই এর পূর্বপরিচয় ঘোষণা করছে।

ডেভিড ম্যানরোর গুলিই একে প্রথম জখম করেছে, আর সুমার বিষাক্ত ক্যাপসুল এর হৃৎস্পন্দন বন্ধ করেছে।

এবারে আমার অস্ত্র শেকসপিয়রের সমসাময়িক এই নৃশংস। জলদস্যুকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিল।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৪

www.bengaliebook.com